রুদ্ধ-প্রাণ - অজেয় রায় Rudra Pran by Ajeo Ray

এক

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরল অমল। হাত মুখ ধুয়ে বাইরের শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা ও ঢোলা জামাটা পরে বসল বারান্দায়। নব এক কাপ ধূমায়িত চা রেখে গেল সামনের টেবিলে। সেই সকাল আটটায় বেরিয়েছে। বেশ ক্লান্ত। গরম চায়ে চুমুক দিল অমল। আহ।

কলকাতা শহরে ভবানীপুর অঞ্চলে এই ছোট দোতলা ফ্ল্যাটটিতে অমল আট বছর বাস করছে। একা থাকে, একটি রাত-দিনের কাজের লোক নিয়ে। সে কলকাতায় এক কলেজে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক। তারই সঙ্গে সাহায্য করছে ডক্টর সেনের গবেষণার কাজে। দেশ বীরভূম জেলার রামপুরহাটে। সেখানে থাকে বিধবা মা, অবিবাহিত একটি বোন এবং ছোট। ভাই। ভাই রোজগেরে। বোন কলেজে পড়ছে।

আঠাশ বছর বয়সি অমল, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছে দু'বছর আগেই। মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা প্রফেসর ডক্টর বঙ্কিমচন্দ্র সেন যে দুরূহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন, সেই কাজ সফল হলে ডক্টর সেনের সহকারী হিসাবে অমলও পাবে বৈজ্ঞানিক মহলে যশ ও প্রতিষ্ঠা।

অঘ্রানের বিকেল। বাতাসে সামান্য শীতের ছোঁয়া। ক্রিং ক্রিং,টেলিফোন বাজল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল অমল, “হ্যাল্লো, অমল রায় বলছি।

—অমল, আমি প্রশান্ত। আরে! কবে ফিরলি? —অমল চমকাল।

—আজই সকালে। তোকে আগে একবার রিং করেছিলাম। শুনলাম, বেরিয়ে গেছিস। সন্ধের আগে ফিরবি না।

—হুঁ, তাই বলে গিছলাম। কিন্তু তুই এত আগে ফিরলি যে। তোর না আরও মাসখানেক বাদে ফেরার কথা? জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে?

খুব খেটে আগেই শেষ করে ফেললাম কোর্সটা। তাই ছুটি পেয়ে গেলাম। তোর খবর কী?

—ভালো।

—হারে, বাবা কোথায়?

মেসোমশাই?—অমল ঢোক গেলে। ঠিক এই প্রশ্নটির আশঙ্কাতেই তার বুক দুরদুর করছিল।

—হ্যা, হ্যা! বাবা কোথায় গেছে? এসে দেখি বাড়ি বন্ধ। দোতলার ভাড়াটে মিস্টার ব্যানার্জি ডুপ্লিকেট চাবি দিলেন। ঘর খুলেছি। মিঃ ব্যানার্জি বললেন, বাবা নাকি কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন মাস চারেক আগে। ঠিকানা দিয়ে যাননি। তুই মাঝে মাঝে বাবার নামে চিঠিপত্র এলে নিয়ে যাস।

কোথায় গিয়েছে বাবা? তীর্থে-টির্থে নাকি? বাবার হিমালয়ে বেড়াবার ঝোক অনেকদিনের। যা ঠিকানাটা বল। আমি গিয়ে নিয়ে আসব। বাবার জন্যেই তো এত খেটে তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একা রয়েছেন। শরীটাও ওঁর ভালো যাচ্ছিল, দেখে গিয়েছিলাম। গজু কোথায়?

অনেক দিন পর দেশে ফেরা এবং প্রিয়জনের দেখা পাওয়ার প্রত্যাশায় উৎফুল্ল প্রশান্ত হুড়মুড় করে বকে যাচ্ছিল। আর তখন? টেলিফোন লাইনের অপর প্রান্তে রিসিভার হাতে কাঠ হয়ে দাড়িয়েছিল অমল। তার মনে ঝড়ের তোলপাড়। সে কি উত্তর দেবে এখন?

অমল খানিক চুপ করে থেকে বলল, দেখ প্রশান্ত মেসোমশায়ের ঠিকানাটা আজ নয়, পাঁচ-ছ'দিন পরে তোকে জানাব।

কেন?—প্রশান্তর বিস্ময়ভরা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ভেসে আসে। মানে, কারণটা তোকে এখুনি বলতে পারছি না। অমল আমতা আমতা করে একটু অসুবিধা আছে। বাবা ভালো আছেন? মানে, সুস্থ আছেন তো? —প্রশান্তের কণ্ঠে গভীর আকুলতা। হা হা, মেলোমশাই ভালো আছেন! তোর চিন্তার কিছু নেই। —অমলের আশ্বাস।

আমি বুঝতে পারছি না, বাবার ঠিকানাটা এখন বলতে তোর আপত্তি কীসের? ব্যাপারটা আমার ক্লিন মনে হচ্ছে না। আমি যাচ্ছি তোর কাছে। ফোনে এত কথা হয় না। তুই অপেক্ষা কর।—প্রশান্ত রিসিভারটা রেখে দিল।

গভীর উদ্বেগ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অমল। কী করবে সে? কিছুই তার মাথায় খেলে না।।

প্রশান্ত অমলের কলেজ জীবনের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছে চার বছর। তবে অনার্স ও এম.এস.সি-তে দুজনের বিষয় ছিল আলাদা। অমলের প্রাণিবিজ্ঞান। প্রশান্তের ফিজিক্স।

প্রশান্ত থাকে দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডে। তার মা নেই। সঙ্গে থাকেন শুধু বাবা। একমাত্র বোন বিয়ের পর চলে গিয়েছে জার্মানিতে। প্রশান্তর বাবা বড় চাকুরে ছিলেন। আপাতত কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রশান্তের বাড়িতে প্রায়ই যেত অমল। অবিনাশবাবু যথেষ্ট স্নেহ করেন তাকে।

প্রশান্ত কাজ করে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। মাস ছয় আগে সে সুইডেনে যায় একটা কম্পিউটার কোর্স শিখতে। অমলের ওপর ভর দিয়ে গিয়েছিল বাবার দেখাশোনার। পয়সার অভাব নেই তাদের। লেক রোডের বাড়িও তাদের নিজের। তবে অবিনাশবাবু মানুষটা বড় একগুঁয়ে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই। বন্ধুও গুটিকয়েক মাত্র। অবসর নিয়ে শুধু বই পড়তেন। তার যত স্নেহ 'ভালোবাসার আশ্রয়, পুত্র প্রশান্ত। প্রশান্তও তার বাবাকে খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সুতরাং বাবার এই রহস্যময় অন্তর্ধানে প্রশান্তর বিচলিত উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। বাইরে মোটর থামার আওয়াজ। নব গেল দরজা খুলতে।

ঋজ, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ প্রশান্ত এসে দাঁড়াল অমলের সামনে। তার সদাহাস্যময় মুখ থমথম করছে। অমল বলল, ‘‘বস।

দুজনে বসে থাকে মুখোমুখি। প্রায় মিনিট খানেক দু’জনেই চুপ। কি বল কিছু - বলল অমল।

বললাম তো বাবার ঠিকানাটা চাই। আমি দেখা করতে যাব কালই। -জোরালো গলায় জানাল প্রশান্ত।

আমিও তো বললাম কদিন পরেই জানতে পারবি। অমলের কথায় জেদি সুর।

দেখ অমল, আমি ফিরে আজ বাবার খোঁজ করতে গিয়ে কিছু খবর পেয়েছি। বাবা কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। এমনকী বাবার ল-ইয়ার মিস্টার দস্তিদার অবধি জানেন না! বাবা নাকি তোকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে গিয়েছেন। যদ্দিন না উনি তার অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে আসেন, টাকাকড়ি সংক্রান্ত সমস্ত লেনদেন ও অন্যান্য ভার। তোকে দিয়ে গিয়েছেন লিখিতভাবে। কোনো কারণে উনি ফিরে না এলে, আমি বিদেশ থেকে না ফেরা অবধি এই ভার তোর ওপরই থাকবে। বাবা নাকি একটা উইলও করে গিয়েছেন। যদি আমি বিদেশ থেকে ফেরার এক মাসের মধ্যে উনি না ফেরেন, তাহলে সেই উইল অনুসারে ওঁর সম্পত্তি বিলি হবে।

আর একটা খবর জানলাম আজ ব্যাঙ্কে গিয়ে। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ত্রিশ হাজার টাকা তুলেছেন। কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে।

আমার আরও একমাস পরে ফেরার কথা ছিল। হঠাৎ এসে পড়তে মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ বেকায়দায় পড়ে গেছিস। বাবাকে নিয়ে তুই কী করেছিস আমি জানতে চাই? স্পষ্ট ও সত্যি কথা না জানালে বাধ্য হয়ে আমায় পুলিশে ইনফর্ম করতে হবে।—শুকনো দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি বলে গেল প্রশান্ত।

অমলের ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, -তুই কি ভাবছিস, টাকার লোভে আমি মেলোমশায়ের কোনো ক্ষতি করেছি? সেই জন্যেই চেপে যাচ্ছি?

প্রশান্ত সামান্য অপ্রতিভ হলেও তার কঠিন মুখ দেখে বোধ হল যে, সন্দেহ কাটেনি। সে ফের বলল, হু, আর একটা ব্যাপার। প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে

আমি বাবার একটা অদ্ভুত চিঠি পাই। চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এই রকম—আমি এক অজ্ঞাত স্থানে যাচ্ছি। কিছুদিনের জন্য। ঠিকানা জানাব না। দেশে ফেরার আগে আমি যেন তাকে আর কোনো চিঠিপত্র না লিখি। কারণ সে চিঠি তিনি পাবেন না। আমি ফিরলে আশা রাখেন সুস্থ দেহে দেখা হবে দু'জনে।।

এই চিঠিটা পেয়ে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার খেয়ালি বাবার এও এক বিচিত্র আচরণ। তবু একটা চিঠি দিই বাবাকে। কিন্তু উত্তর পাইনি। এই কারণেই আমি প্রাণপণে খেটে যতটা সম্ভব আগে ফিরেছি দেশে।

অমল মুখ নিচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, - প্রশান্ত এ বিষয়ে এক্ষুণি একটি কথাও বলতে পারব না। আমায় মাপ কর। আজ রাত্তিরটা অপেক্ষা কর। কাল সকাল আটটা নাগাদ তোকে টেলিফোন করব। তখন যা সম্ভব হয় জানাব। তারপর তোর যা খুশি করিস।

প্রশান্ত বুঝল, অমলের কাছ থেকে এখন আর বেশি কথা বের করা যাবে না। সে উঠে দাঁড়াল। এবং গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল।

অমল ঘড়ি দেখল। সোয়া দুটা। আরও অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে দিল্লিতে ট্রাঙ্ক-কল করবে প্রফেসর সেনকে। ডক্টর সেন রাত সাতটার আগে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফেরেন না।

প্রফেসর সেনের নির্দেশের ওপরই নির্ভর করছে তার আগামিদিনের কর্তব্য। নিচে প্রশান্তর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ হল।

অন্ধকার বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে অমলের মন পিছিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খায় মাস পাঁচেক আগের কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা জড়ানো স্মৃতির আবর্তে।

তারিখটা ঠিক মনে নেই অমলের। দিনটা সোমবার। বিকেল চারটে নাগাদ সে দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রশান্তের বাবা অবিনাশবাবুর সম্মুখে।

এই সময়টা সামান্য দিবানিদ্রার পর উঠে চা খান অবিনাশবাবু। অমলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, “আরে কী ব্যাপার, এমন অসময়ে? মনে হচ্ছে কোনো ইমপর্ট্যান্ট খবর আছে? ভালো না মন্দ? বিচ্ছু কেমন আছে?

অমল উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল,—খবর ভালো। ওঃ কাল সারাটা দিন যা টেনশনে ছিলুম।

ভেরি গুড। ভেরি গুড! ও, তাই কাল আসোনি। রবিবার তো তুমি একবার ঢু মেরে যাও। যাক, বিচ্ছু খাওয়া দাওয়া করছে ?

খেলছে?

—আগের মতো লাফালাফি করছে না এখনও। তবে চলাফেরা করছে। এখনও পুরোপুরি জড়তা কাটেনি। তবে ক্রমেই ফিট হয়ে উঠছে।

—চিনতে পারছে ঠিক মতো? মানে ব্রেন, মেমারি সব ফাংশন ঠিকঠাক?

—মনে তো হয়। অবশ্য আরও কয়েকদিন অবজার্ভ না করলে বোঝা যাবে না।

–যাক কনগ্রাচুলেশনস। তোমাদের রিসার্চে একটা বড় স্টেপ এগোল। তোনারও একটা মস্ত পার্সোনাল প্রবলেম মিটল। যা একখানি ভক্ত জুটিয়েছ। চা খাবে?

পরম নিশ্চিন্তে অবিনাশবাবুর সামনে, চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিল অমল। একটু বাদেই অবিনাশবাবুর পরিচারক গজ নিয়ে এল চা ও কেক।

উঃ, বিচ্ছুকে নিয়ে কী ঝামেলায় যে পড়েছিল অমল! বিচ্ছু, অমলের পোষা কুকুর। বয়স দেড় বছর। কলকাতা শহরে ফ্ল্যাট বাড়িতে কুকুর। পোষার শখ কোনোদিনই ছিল না অমলের। যদিও সে খুব কুকুর ভালোবাসে। কিন্তু হঠাৎ জুটে গেল একটা কুকুর বাচ্চা। মানে জুটিয়ে আনল শ্রীপতি—অমলের পুরনো কাজের লোক। রাস্তার দেশি কুকুরের বাচ্চা। মাসখানেক বয়স। ওর মা মোটর চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। অনাথ বাচ্চাটাকে বুকে তুলে বাড়িতে হাজির শ্রীপতি।

অমল প্রথমে রাগ করেছিল, —কে এটার দেখাশোনা করবে? আমার সময় কই?

শ্রীপতি অমলের দেশের লোক। অমলকে ছোটবেলা থেকে দেখছে। সে শুধুমাত্র পরিচারক নয়। অমলের একার সংসারের গার্জেনও বটে । একটু ধমকের সুরে বলেছিল শ্রীপতি, সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

অতএব রয়ে গেল কুকুরটি। নাম দেওয়া হল বিচ্ছু। ওর স্বভাবের কারণেই। যা দই বুদ্ধি! দেখতে দেখতে তার চেহারাটি হল খোলতাই। সাদা কালো রং। লোমভরা চকচকে গা। যেমনি গাট্টা গড়ন, তেমনি বিক্রম। অচেনা লোককে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ফ্ল্যাটে। দেখতে দেখতে বিচ্ছুর ওপর ভারি মায়া পড়ে গেল অমলের।

বাড়িতে সময় পেলে অমল বিচ্ছুর সঙ্গে খেলা করত। সুযোগ পেলেই বিচ্ছু অমলের কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে লেজ নেড়ে সোহাগ জানাত। সে অপেক্ষা করে থাকত সন্ধ্যায় বা রাতে অমল কখন বাড়ি ফেরে। অমল বাড়ি এসে নিচের দরজায় কলিং বেল টিপলেই, ঠিক বুঝতে পারত সে। দৌড়ে গিয়ে দরজার ওপর আঁচড়াতে থাকত। চেনে বাঁধা থাকলে, চিৎকারে বাড়ি মাথায় করত। অমল ভিতরে ঢুকে খানিক আদর করলে, তবে শান্তি।

সমস্যা হল, নয় দশ মাস বাদে শ্রীপতি অসুস্থ হওয়ার পর। শ্রীপতির বয়স হয়েছিল। কে তার সেবা করে? অমল তাই ওকে দেশে, ওর ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিল। বলল,—চিকিৎসা করাও, খরচ আমি দেব।

শ্রীপতির এক জ্ঞাতির ছেলে, বছর কুড়ির নব এল অমলের কাছে কাজ করতে। শ্রীপতির শরীর আর সারল না। ফলে নব পাকাপাকিভাবে বহাল হল অমলের কাছে।

প্রথম প্রথম বিচ্ছু নবকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে না পারলেও ক্রমে ক্রমে অনেক চেষ্টায় নব ভাব জমিয়ে ফেলল বিচ্ছুর সঙ্গে। অমল হাঁপ ছাড়ল।

কিন্তু চারদিনের জন্য দুর্গাপুরে গিয়েই সে টের পেল সমস্যা ঘোচেনি।

দুর্গাপুরে যাওয়ার তৃতীয় দিনে ভোরে টেলিফোন এল কলকাতা থেকে। অমলের। নিচের তলার ভদ্রলোক ফোনে জানালেন যে, বিচ্ছু কেবল কাঁদছে। নব বলেছে ও কাল থেকে কোনো খাবার ছোঁয়নি। মনে হচ্ছে বিচ্ছু অমলকে খুঁজছে। ওর চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আশেপাশের বাড়ির লোক। কেউ কাছে গেলেই দাঁত খিচোচ্ছে।

অগত্যা সেদিনই সকালে কলকাতায় ফিরতে হল অমলকে, কাজ পুরো শেষ না করেই। তাকে দেখেই বিষন্ন ক্ষিপ্ত বিচ্ছুর কী আশ্চর্য পরিবর্তন! আহ্লাদে ডগমগ।

অমল তাকে খেতে দিতেই গবগব করে গিলে ফেলল দুবেলার মোট আহার।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই অমলের ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার কথা হল, প্রফেসর সেনের রিসার্চের প্রয়োজনে। ব্যাপারটা জরুরি। প্রফেসর সেন বা অমল ছাড়া আর কেউ গেলে হবে না। বিশেষ নকশা অনুযায়ী একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বানিয়ে আনতে হবে ওখানকার এক কারখানা থেকে। এবং তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। যাওয়া, আসা, থাকা মিলে অত দু সপ্তাহ থাকতে হবে কলকাতার বাইরে। হয়তো আরও কয়েকদিন বেশিও লাগতে পারে। ডঃ সেনের অসুবিধা ছিল। অতএব অমলই ভরসা।

অমলের আর কোনো অসুবিধা ছিল না। সমস্যা একটাই—বিচ্ছু। ও তো উপবাস দিয়ে মারা পড়বে। অমলকে এত দিন না দেখে রাগে দুঃখে পাগল না হয়ে যায়।

মহা আতান্তরে পড়ল অমল। উপায় কিছু খুঁজে না পেয়ে সমস্যাটা জানাল স্যারকে। অর্থাৎ, ডঃ বঙ্কিম সেনকে।

সব শুনলেন ডঃ সেন। পরদিন একটা উপায়ও বাতলালেন। নিরুপায় অমল তাতেই রাজি হল।

ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফিরে দু'দিন খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছে অমলের। যাক তারপর নিশ্চিন্দি। ডঃ সেনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। বিছুকে ছেড়ে বাইরে যেতে অমলের 'আর ভাবনা রইল না।

মনে আছে, অবিনাশবাবুকে বিচ্ছুর খবরটা দিয়ে আসার পরদিনই অমল শুনল তিনি অসুস্থ। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পাড়ার লোকই, উদ্যোগ করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে তাকে।

অমল ছুটে গিয়েছিল তাকে দেখতে। অ্যাটাকটা অবশ্য গুরুতর নয়। কয়েকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন। তবে বাড়িতে সেবা যত্ন চাই। অমল বলছিল, —প্রশান্তকে খবর দিই।

অবিনাশবাবু এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন প্রস্তাব। তার বক্তব্য,অনেক কষ্টে খোকা এই ফেলোশিপটা জোগাড় করেছে। মাত্র এক মাস হল গিয়েছে। এখন ফিরে এলে কোর্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এমন সুযোগ হয়তো আর পাবে না।

আমি আজ না হয় কাল যাবই ওপারে। কিন্তু খোকার ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। আমার এই অসুস্থতার খবরও এখন ওকে দেওয়ার দরকার নেই।

জার্মানিতে মেয়েকেও খবর দিতে দেননি অবিনাশবাবু। মাত্র তিনমাস আগে ও ঘুরে গিয়েছে। এলেও বা কতদিন থাকতে পারবে? শুধু একবার চোখে দেখার জন্যে অদুর থেকে ঘর সংসার ফেলে, চাকরিতে ছুটি নিয়ে হুট করে আসা কত অসুবিধের!

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার কিছুদিন বাদে অবিনাশবাবু একদিন বললেন, - দেখ অমল ডাক্তার বলছিলেন আমার শরীরটা বিগড়েছে। এ যাত্রায় ফাড়া কেটে গিয়েছে, তবে সেকেণ্ড অ্যাটাকটা সিরিয়াস হতে পারে। এবং ডাক্তারের কথায় বুঝেছি যে, সেটা যে কোনো সময় হওয়ার সম্ভাবনা। আগেই বলেছি মরতে আমার দুঃখ নেই। শুধু একটাই ইচ্ছে, মরণকালে খোকা যেন আমার কাছে থাকে। প্রশান্তকে তাহলে আসতে লিখি?—বলেছিল অমল।

-না না, তা হয় না। এর কোর্স শেষ হোক।

অবিনাশবাবু খানিক চিন্তামগ্ন থেকে বলেন — জানো অমল, ডাক্তার বলছিলেন যে আমার দেহযন্ত্রটি কিঞ্চিৎ মেরামত করলে আরও অনেকদিন টিকে যাব। ওপেন্-হার্ট সার্জারি করা দরকার। এই অপারেশন এদেশেও হচ্ছে আজকাল। তবে অনেক হাঙ্গামা। যথেষ্ট টাকাও লাগে। টাকা ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু খোকা ছাড়া অন্যের ঘাড়ে আমি এত ঝামেলা ও দায়িত্ব ফেলতে পারি না। খোকা ফিরুক। তবে তার আগেই যদি হঠাৎ টেসে যাই? —বিষণ্নভাবে হাসেন তিনি।

অমল চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না। পরামর্শ দেওয়া বৃথা। কারন শুনে চলার লোক নন অবিনাশবাবু। নিজে যা ভালো বঝবেন তাই করবেন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক নীরবতার পর অবিনাশবাবু বললেন, একটা উপায় ভেবেটি, বিচ্ছুর মতো আমাকেও যদি—? অমল চমকায়। স্তম্ভিত ভাবে চেয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বলে,—

কিন—তু! অবিনাশবাবু মৃদু হেসে বলেন, “কী? বিপদের কথা ভাবছ? রিস্ক নেওয়ার অতে আমার আছে। জীবনভর ঢের রিস্ক নিয়েছি। যাক, তুমি ডক্টর

সেনকে একবার আমার কাছে আসতে বলো। বলবে, আমার অনুরোধ। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই আমি প্ল্যানটাকে ফাইনাল করব।

সেই সব কথা ও ঘটনা একে একে মনে ভেসে আসে অমলের।

তিন

সকালে অমল ফোন করল প্রশান্তকে, আমার কাছে চলে আয় তোর গাড়ি নিয়ে। তারপর দুজনে এক জায়গায় যাব। কোথায়?—প্রশান্তর প্রশ্ন।

—দেখতেই পাবি। কী নার্ভাস লাগছে আমার সঙ্গে বেরোতে?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর আসে না। খট করে শব্দ ভেসে এল। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে প্রশান্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত হাজির হল অমলের বাসায়। অমল তৈরি হয়ে ছিল। দু'জন বেরোল।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ল মোটর। অমলের নির্দেশমতো চালাচ্ছে প্রশান্ত। সিঁথির একটু আগে ডান ধারে একটা রাস্তা ধরে বেঁকল! তারপর কিছু এঁকেবেঁকে গিয়ে থামল এক তালা-বন্ধ লোহার গেটের সামনে।

একটি লোক দ্রুত পায়ে এসে খুলে দিল গেট। গাড়ি ভিতরে ঢুকে থামল একটা মাঝারি দোতলা বাড়ি থেকে খানিকদূরে কয়েকটি একতলা ঘর ও টিনের শেড। ইলেকট্রিক ও টেলিফোন লাইন রয়েছে। | একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে খোলা সদর দরজায়। রোগা, লম্বা চোখে চশমা ট্রাউজার্স ও ফুলশার্ট পরা। কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছে প্রশান্তকে।

অমল বলল, এটা একসময় ছিল জমিদারের বাগান বাড়ি। তারপরে কারখানা।

আপাতত ডঃ সেনের প্রাইভেট ল্যাবরেটরি।

প্রশান্ত কথা বলে না। তার সন্দিগ্ধ সতর্ক চোখ ঘুরছে চারধারে। ' কী অজয়, নতুন কোনো খবর? – বলল অমল।

দরজায় দাঁড়ানো যুবক মাথা নাড়ল। অর্থাৎ-না।

ডেইলি চেক-আপ সব সাটিসফ্যাক্টরি ?

—হ্যা, শুধু একটা... বেশ যাচ্ছি আমি, চল। আয় প্রশান্ত। ডাকল অমল।

বাড়িটায় ঢুকেই প্রশস্ত এক কক্ষ। প্রায় খালি। এক কোণে কয়েকটি বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল! মাথার ওপর সিলিং-ফ্যান। চেয়ার দেখিয়ে অমল বলল,- প্রশান্ত বস এখানে, আমি আসছি এক্ষুণি। প্রশান্ত বসল।

কফি খাবি?

—এখন নয়, তুই ফিরলে।

—অলরাইট।

অমল একটা ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। অজয় নামে যুবকটি গেল তার পিছু পিছু।

একা আড়ষ্ট হয়ে থাকে প্রশান্ত। অমলের ব্যবহার থেকে সে কোনো হদিশ খুজে পায় না। কেমন রহস্যময় চাপা লুকনো ভাব। যদিও ভয় পাওয়ার মতো কোনো ইঙ্গিত নেই! মনে হচ্ছে অমল কিছু দেখাতে চায়। কিছু বলতে চায় গোপনে। কী এমন ব্যাপার? বাড়িতে না বলে ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে টেনে আনার কারণ? এর সঙ্গে তার বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্পর্কই বা কী? এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ ব্যাকুল চিত্তে প্রশান্ত প্রতীক্ষায় থাকে।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এল অমল। বসল প্রশান্তর পাশের চেয়ারে। কফি এল।

দুজনে চুমুক দেয়। অমল ডুবে আছে কোনো গভীর চিন্তায়। নির্বাক। প্রশান্ত লক্ষ করে। ওকে। এক সময় অমল নীরবতা ভাঙে। ধীর স্বরে বলে, তোকে এখানে কেন এনেছি জানিস?

—না। আমার দিব্যদৃষ্টি নেই।

প্রশান্তর বিপে কান না দিয়ে, একই সুরে অমল বলল, তোকে এখানে এনেছি, কারণ এখানেই আছেন মেসোমশাই। অর্থাৎ তোমার বাবা, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বোস।।

সেকি! কোথায় ?—দাঁড়িয়ে ওঠে প্রশান্ত।

বোস।মৃদু স্বরে হাত নেড়ে নির্দেশ দিল অমল।

মানে? -প্রশান্ত উত্তেজিত। আমি এক্ষুনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তোর অনেক হেঁয়ালি সহ্য করেছি।

আগে আমার কথাগুলো শোন। অমলের গলা একটুও চড়ে না। তার সেই ধীর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব যেন ক্রমে সম্মোহিত করে প্রশান্তকে। বাধ্য করে তাকে চেয়ারে বসতে। অমলের কথার প্রতি মনোযোগ দিতে। অমল বলল, প্রথমেই সংক্ষেপে বলি, মেসোমশাই এখন ঘুমিয়ে আছেন।

আঁ, এত বেলা অবধি!—ধড়ফড় করে উঠল প্রশান্ত : বাবা তো খুব ভোরে ওঠেন। ডেকে দাও। বলো, আমি এসেছি।

অমল শান্ত কণ্ঠে বলল, -এখুনি ওঁকে ডেকে তোলা সম্ভব নয়। কারণ এ ঘুম সাধারণ ঘুম নয়।

-কেন? বাবার শরীর কি ভালো নেই? প্রশান্তর কথার জবাব না দিয়ে অমল বলল,—হাইবার্নেশন কী জানিস?

অবাক হয়ে প্রশান্ত বলল, হাইবার্নেশন?

হা, মানে, শীত-ঘুম। সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি শীতে গর্তে ঢুকে সারা শীতটা মড়ার মতো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াকেই তো হাইবার্নেশন বলে?

অমল বলল,হু, ঠিকই বলেছিস। তবে শুধু শীতল রক্তের সরীসৃপ নয়, কিছ উচ্চ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীরও এমনি হাইবার্নেট করার অভ্যাস আছে। বিশেষত ঠান্ডা দেশের কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর। যেমন উত্তর-মেরু প্রদেশের কাঠবেড়ালি।

হাইবার্নেশন হচ্ছে জীবের শরীরে এমন এক রাসায়নিক পরিবর্তন, যার ফলে তার দেহে মেটাবলিজম্ অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়া খুব মন্থর হয়ে যায়। তখন তার দেহে ক্ষয় হয় খুব সামান্য। দেহের তাপ খুব নেমে আসে। রক্ত স্রোত চলে অতি ধীরে। হৃৎস্পন্দনের হার খুব কমে যায়। ফলে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হাইবানেট অবস্থায় জীবদেহের অতি সামান্য শক্তি খরচ হয়। কেবল প্রাণটুকু জিইয়ে থাকে। সে আবার জেগে ওঠে, দেহে বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে।

শীত কেটে গিয়ে গরম পড়লে সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি যারা শীত ঘুম দেয়, তাদের দেহে বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পরিবেশ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য।

আধুনিককালে অনেক বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করছেন, যেসব প্রাণী স্বাভাবিকভাবে হাইবানেট করে না তাদের কীভাবে কৃত্রিম উপায়ে অমনি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এবং ফের তাদের জাগানো যায় প্রয়োজন মতো। কৃত্রিম হাইবার্নেশনকে অবশ্য আমি শীত-ঘুম বলব না। বলব হিম নিদ্রা। কারণ এই ব্যবস্থায় শরীরকে হিম শীতল করে ঘুমে আচ্ছন্ন করার জন্য, বাইরের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার হয় না। সময়টা শীত না গ্রীষ্ম তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এই ব্যবস্থায় জীবের শরীর হিম শীতল করা হয় কৃত্রিম উপায়ে।

মানুষকেও হাইবার্নেট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিছুটা সম্ভবও হয়েছে। আমার গুরু প্রফেসর সেনের গবেষণা এই নিয়েই—হিউম্যান হাইবার্নেশন। বাবাকে কি? প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রশ্নটা শেষ করতে পারে না প্রশান্ত।

–হ্যা, ঠিক ধরেছিস। মেসোমশাইকে এখন হাইবার্নেটেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। উনি এখন ঘুমে অসাড়। অচেতনই বলা যায়।

—কিন্তু বাবাকে কেন?

শখ করে নয়, প্রয়োজনে। এবং আমার বা ডক্টর সেনের বৈজ্ঞানিক খেয়াল মেটাতে নয়। মেসোমশায়ের একান্ত ইচ্ছার ফলেই ওঁকে এইভাবে রাখা হয়েছে। প্রায় জোর করে আমাদের বাধ্য করেছেন!

-কেন?

—মাস পাঁচেক আগে মেসোমশায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়। মাইল্ড অ্যাটাক। অল্পদিনেই সামনে উঠেছিলেন। তোক কিছুতেই খবর দিলেন না, পাছে তোর

ট্রেনিং-এ ক্ষতি হয়। ডাক্তাররা বললেন, এইরকম অ্যাটাক ফের হতে পারে এবং তাহলে সিরিয়াস হবে। প্রাণহানির সম্ভাবনাও রয়েছে। একমাত্র ওপন হার্ট সার্জারি করলে মেলোমশাই আবার পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু মেসোমশায়ের একটাই ভয়, তুই ফিরে আসার আগে যদি ফের ওঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়। যদি শেষ সময়ে তোকে দেখতে না পান। অথচ তোকে কোর্স শেষ না করে আসতে দেবেন না। এই সময়ে ওঁর মাথায় এই বুদ্ধিটা জাগে! উনি জানতেন ডক্টর সেনের সঙ্গে আমার রিসার্চের বিষয়। প্রায়ই এই নিয়ে কৌতুহলী প্রশ্ন করতেন আমাকে!

ওঁর হার্ট-অ্যাটাক হওয়ার ঠিক আগের দিনই আমি মেলোমশাইকে খুশি হয়ে বলেছিলাম, আমার প্রিয় কুকুর বিচ্ছুর কথা। বিচ্ছুকে বাড়িতে রেখে বাইরে যাওয়া আমার। মহা সমস্যা হয়েছিল। আমি রাতে না ফিরলে ও পরদিন থেকে খাওয়া বন্ধ করবে। বিদ্যুকে দু'হপ্তার জন্য হাইবার্নেশনে রেখে আমি ব্যাঙ্গালোর ঘুরে আসি। তারপর সাকসেসফুলি বিচ্ছুকে জাগাই ওর কৃত্রিম হিমনিদ্রা থেকে। যাহোক, মেলোমশাই ধরলেন, তাকেও হাইবার্নেশনে রাখা হোক, যদ্দিন না তুই বিদেশ থেকে ফিরিস। তাহলে আর ওই সময়ে ওঁর হার্ট-অ্যাটাকের ভয় থাকবে না। কারণ হাইবানেশন পিরিয়ডে দেহের রক্ত চাপ খুব কমে যায় এবং নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডঃ সেন প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না এই প্রস্তাবে। কারণ হিউম্যান-হাইবানেশনের আফটার-এফেক্ট কী হতে পারে, তা নিয়ে আমাদের অনেক কিছুই জানার বাকি ছিল। আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট দরকার। দুম করে মেসোমশাইকে নিয়ে পরীক্ষা করতে আমাদের ভরসায় কুলচ্ছিল না। কিন্তু মেসোমশাই জেদ ধরলেন। বললেন, যে সে রিস্ক। তার। যদি কোনো অঘটন ঘটে, এমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য আত্মদানও নাকি গৌরবময়। আমরা গোড়ায় রাজি না হতে উনি রীতিমতো চটে গেলেন। তখন ভয় হল। এই কারণেই না ওঁর ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গিয়ে বিপদ ঘটে। অগত্যা ডঃ সেন রাজি হলেন।

ঠিক ছিল, তুই ফিরে আসার কয়েকদিন আগে ওঁকে হিম-নিদ্রা থেকে জাগানো হবে। সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা হবে। তুই আচমকা এসে পড়তে সব প্ল্যান ভেস্তে গিয়েছে। অবশ্য আমার মনে হয় তুই আগে ফেরাতে ভালোই হয়েছে! বরং দেরি হলে,-বলতে বলতে অমল হঠাৎ চুপ করে যায়। কী যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল।

সপ্রশ্ন ভাবে তাকায় প্রশান্ত।

অমল উত্তর দেয় না।

প্রশান্ত বলল, —তা এই কথাগুলো কাল বললি না কেন? মিছিমিছি একটা মিস। আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

অসুবিধা ছিল রে। - জানাল অমল : ডঃ সেনের অনুমতি ছাড়া এসব নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করা বারণ। তুই ঠিক সময়ে এলে হয়তো জানতেই পারতিস না। এই কয়েক মাস মেলোমশাই কীভাবে কাটিয়েছেন। ডঃ সেন এখন দিল্লিতে। দু-তিন দিন বাদে ফিরবেন। কাল রাতে ট্রাঙ্ক কল করে আমি ওর কাছে জানতে চাই কী করব? উনি পারমিশন দিতে আজ তোকে সব বললাম। হ্যা আর একটা কথা, মেসোমশায়ের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে খরচ হিসেবে। হাইবানেশনে খরচ বেজায়। ডঃ সেন বলেছেন, যে ইচ্ছে হলে তুই তোর বাবাকে একবার দেখতেও পারিস।

-মানে ওই রকম ঘুমন্ত অবস্থায়?

—হ্যা। ডঃ সেন ফিরে না আসা অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। মেলোমশায়কে তার আগে জাগানো সম্ভব নয়।

বেশ চল। বলল প্রশান্ত। দু’জনে উঠে দাঁড়াল।

প্যাসেজ দিয়ে খানিক হেঁটে অমল দাঁড়াল একটা ঘরের সামনে। পাশে দেওয়াল আলনায় ভোললানো কয়েকটা মোটা কাপড়ের অ্যাপ্রোন। পোশাকের ওপর তাই একটা চাপিয়ে নিল অমল। প্রশান্তকেও একটা পরতে বলল।

এক পাল্লার আঁট হয়ে চেপে বসা কপাট। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল অমল, পিছু পিছু প্রশান্ত।

ছোট ঘর। তাতে একটা মাত্র কাচের বন্ধ জানলা। ঘরটা এয়ারকন্ডিশন করা। বেশ শীত শীত। উল্টো দিকের দেওয়ালে একই রকম দেখতে আর একটা দরজা। প্রশান্তের মনে হল যেন একটা বড় হলঘরকে দেওয়াল তুলে ভাগ করা হয়েছে। সেই দেওয়ালে কাচ লাগানো। একটা বড় ফোকর।

ঘরের এক ধারে পিয়ানোর মতো দেখতে একটা যন্ত্র। তাতে কাচে ঢাকা ছোট ছোট খোপ। মনে হল ডায়াল ও মিটার। ভিতরে আলো জ্বলছে। কাটা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ঘরে কয়েকটি কম্পিউটার জাতীয় বিচিত্র দর্শন যন্ত্র। সামনের দেওয়ালের দুটো ফুটো দিয়ে। অনেকগুলি সরু মোটা বৈদ্যুতিক তার ও নল এসে যুক্ত হয়েছে এ ঘরের যন্ত্রগুলিতে। এই যন্ত্রগুলির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে দেওয়ালের সুইচ-বোর্ডে।

বড় যন্ত্রটির সামনে চেয়ারে বসে, সেই অজয়। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অজয়কে ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে, অমল এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ঘরের অন্য প্রান্তের দরজার সামনে। চাবি লাগিয়ে দরজাটা খুলল। প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল সেই ঘরে। দরজা বন্ধ হল। এই ঘরটাও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরে একটিমাত্র কাচের শাশি আঁটা জানলা।

ঘরের ভিতর নিচু নিচু কাঠের স্ট্যান্ডের উপর নানান আকারের কয়েকটি বাক্স শোয়ানো। বাক্সগুলি ধাতু নির্মিত, তবে ওপরে স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের ঢাকনা।

অমল সোজা গিয়ে দাঁড়াল, একটা লম্বা বড় চারকোনা বাক্সের পাশে। প্রশান্ত বাক্সের স্বচ্ছ ওপরের অংশ দিয়ে দেখতে পেল, ভিতরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তার বাবাশ্রীঅবিনাশচন্দ্র বোস। পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে তার বুক অবধি ঢাকা। শুধু হাত দুটো বাইরে বার করা।

অবিনাশবাবুর চোখ বোজা। দেহ যেন একেবারে নিথর। তবে বিগতপ্রাণ মানুষের মতো তার মুখের ভাব ফ্যাকাসে নয়। সামান্য রক্তাভ। মাথা, বুক ও দেহের নানা জায়গায় কয়েকটি বৈদ্যুতিক তার ও নল আটকানো। সেগুলি বাক্স থেকে বেরিয়ে ঘরের দেওয়ালের দুটো ফুটো দিয়ে সামনের ঘরে চলে গিয়েছে। অবিনাশবাবুর বাম বাহুতে লাগানো সরু একটা নল গিয়ে ঢুকেছে তার আধারের পাশে রাখা একটি ছোট চৌকো কাচের বাক্সে। ওই বালোর মধ্যে মস্ত চিনাবাদামের আকারের লাল রঙের একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের মতো জিনিস। নল তার সঙ্গে যুক্ত। আবার ওই লাল বাদাম আকৃতির ব্যাগ থেকে অন্য একটি নল গিয়ে ঢুকেছে অবিনাশবাবুর চাদরের তলায়।

ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা তার বাবাকে এমন অসহায়ভাবে দেখে প্রশান্তর বুকে মোচড় দিল, ভারি কষ্ট হল। আগেকার সেই মানুষটিকে ফের ফিরে পাবে

তো? প্রশান্তের মনে হল বাবাকে যেন একটা কফিনে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সে বাবার দেহ সংলগ্ন নল ও তারগুলি দেখিয়ে প্রশ্ন করল, এগুলো কী?

অমল বলল,-এই তারগুলো ওঁর শরীরে বসানো ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত। ওঁর ব্রেনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হৃৎপিণ্ড কেমন চলছে ওগুলির মাধ্যমে তা জানা যায়। নলগুলি দিয়ে মাপা হচ্ছে ব্লাডপ্রেসার এবং আরও কিছু শারীরিক ক্রিয়া। এইসব তার ও নল পাশের ঘরে কিছু যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দিচ্ছে ওঁর দৈহিক অবস্থা। কোনো গন্ডগোল দেখা দিলেই ওয়ার্নিং দেবে। আমরা পালা করে ওয়াচ রাখি ইন্ডিকেটর প্যানেলে। আসার সময় তো দেখলি অজয় ডিউটি দিচ্ছে।

আর, পাশে ওই কাচের বাক্সে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের মতো জিনিসটি হচ্ছে আর্টিফিসিয়াল -কিডনি। মানুষের কিডনি হাইবানেশনের সময় ঠিক মতো কাজ করে না। তাই কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে রক্তকে পরিত করে দূষিত ইউরিন বের করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। দেখ, ওঁর বাঁ হাতে লাগানো একটা নল গিয়ে ঢুকেছে কৃত্রিম কিডনিতে। ওই পথে ওঁর রক্ত বেরিয়ে গিয়ে কৃত্রিম কিডনিতে পরিশ্রুত হয়ে অন্য নল দিয়ে ফের দেহে ফিরে যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, "শাস প্রশ্বাস হচ্ছে না যে? বুকের ওঠানামা কই?

হচ্ছে বইকি। বলল অমল: নইলে বেঁচে আছেন কী ভাবে? তবে ওঁর হৃৎপিণ্ড চলছে খুব আস্তে আস্তে। তাই চট করে বোঝা যাচ্ছে না বুকের ওঠানামা।

বাবাকে এই অবস্থায় আনা হল কীভাবে?—কৌতূহল জাগে প্রশান্তর।

স্যার, মানে ডঃ সেন কিছু কিছু বলতে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য খুঁটিনাটিতে যাব না ওটা আমাদের সিকরেট। মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি।

প্রথমে ওঁর শরীরে নানান জায়গায় ইলেকট্রোড বসানো হয় এবং দেহের ভিতরকার রক্তস্রোত ও অন্যান্য ক্রিয়াগুলিকে ওয়াচ দ্রার ব্যবস্থা হয়। এরপর উনি শুয়ে পড়েন এই হিমনিদ্রার আধারে।

তারপর জেনেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ প্রয়োগ করে ওঁকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। ওঁর দেহে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কিছু রাসায়নিক দ্রব্য।

মানুষের দেহে যেসব রাসায়নিক ক্রিয়া, ক্ষয় বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্তন আনে এবং তাপ সৃষ্টি করে, এই রাসায়নিক মিশ্রণ তাকে বাধা দেয়। ফলে দেহের উত্তাপ কমে দাঁড়ায় বরফ জমা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। মাত্র দু-তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। চালু করা হয় আর্টিফিসিয়াল কিডনি। দেহযন্ত্রকে সজীব রাখার জন্য কিছু পুষ্টিকর বস্তুও ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনজেকশনের সাহায্যে। অবশ্য উনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। শ্বাস-প্রশ্বাস চলে কৃত্রিম উপায়ে। হৃৎস্পন্দনের হার মিনিটে দু-তিনটি মাত্র এবং খুবই মৃদু। নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ চলেছে ইনজেকশনে, যাতে রক্তকণিকা জমাট না বেঁধে যায়। এই অবস্থাই হচ্ছে হিউম্যানহাইবার্নেশন। মানুষের হিম-নিদ্রা। এই বিশ্রাম আধারটিকে বলা হয় হাইবার্নেকুলাম। আর এই ঘরকে বলা যায় হাইবার্নেশন চেম্বার।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত একটি ধমনীর এক জায়গা পুরু হয়ে যাওয়াই মেসোমশায়ের হৃদরোগের কারণ। এই হিমনিদ্রায় থাকার সময় দেহের বৃদ্ধি ঘটে না, এবং আগেই বলে ব্লাড-প্রেসার খুব কমে যায়। ফলে এই অবস্থায় ওঁর খারাপ আর্টারিটি আরও বেশি খারা অর্থাৎ পুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং রক্ত স্রোতের গতি অতি ধীর হওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। বাবা কি সাড়ে তিন মাস ধরেই এই অবস্থায় আছেন? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

অমল বলল, মোটামুটি তাই। তবে প্রতি দশ-পনেরো দিন অন্তর ওঁর দেহের তাপ বাড়িয়ে মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা, অর্থাৎ প্রায় ৩৭° সেন্টিগ্রেড করা হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তখন ওঁকে অচেতন থেকে আচ্ছন্ন অসাড় অবস্থায় আনা হয়। যাতে ওঁর দেহকোষে শক্তির ক্ষয় পূরণ করা যায়।

বাবাকে এইভাবে দেখতে প্রশান্তর আর ভালো লাগছিল না। সে বলল, অমল এবার চল যাই, কেমন দম বন্ধ লাগছে।

ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে হঠাৎ প্রশান্ত অন্য দুটি বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, —ওগুলো কী?

—ওগুলোও হাইবার্নেকুলাম। অর্থাৎ হিম-নিদ্রার আধার।

দু'জনে একটা হাইবার্নেকুলামের পাশে দাঁড়ায়। দেখা গেল, ভিতরে নিদ্রায় অসাড় দুটি ইদুর এবং একটি কুকুর।

যেতে যেতে অমল বলল, আর একটা ঘরে আছে আমাদের ল্যাবরেটরি। রিসার্চ চলছে সেখানে।

দু'জনে আবার গিয়ে বৈঠকখানায় বসল। আরও এক রাউন্ড কফি এল বিস্কুট সহযোগে। প্রশান্তর মনে তখন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

পাচ

আমার বাবাই কি তোমাদের হিউম্যান-হাইবানেশন এক্সপেরিমেন্টের প্রথম কেস? –জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

না।—উত্তর দিল অমল। আর একজনকে নিয়ে আমরা আগে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। কাকে? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে। প্রশান্তর প্রশ্ন।

কিছু বাধা নেই, বলল অমল; ব্যাপারটা হয়েছিল কি, মাস ছয়েক আগে একদিন দেখি এক বৃদ্ধ ল্যাবরেটরির সামনে রাস্তায় গাছতলায় শুয়ে। বৃদ্ধ খুবই শীর্ণ ও অসুস্থ। তাকে এই বাড়িতে এনে খেতে দিলাম, কিছু চিকিৎসাও করলাম। সামান্য সুস্থ হল। কিন্তু সমস্যা দাড়াল, তাকে এখন পাঠাই কোথায়? কার কাছে? লোকটি কিঞ্চিৎ জড়বুদ্ধি। তবে তার চেহারায় পোশাকে ভদ্র সন্তানের ছাপ।

কোথায় বাড়ি কে কে আছে? হাজার প্রশ্ন করেও তার কাছে বিশেষ উত্তর মিলল না। এ বাড়ি ছেড়ে নড়তেও চায় না। মাঝে মাঝে একটা নাম বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। অনেক জিজ্ঞসার পর বোঝা গেল ওটা তার ভাইয়ের নাম। কিন্তু তার ভাইয়ের ঠিকানার কোনো হদিশ পেলাম না।

লোকটি খুবই অসুস্থ। কিডনি খারাপ। আমরা প্রথমে ঠিক করলাম ওকে মাদার টেরেসার হোমে দিয়ে আসব। কিন্তু স্যার দিলেন অন্য এক প্রস্তাব। বললেন যে ওকে কিছু দিন হাইবানেশনে রেখে দেওয়া যাক। হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই ওর বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যাবে। হোম-এ পাঠালে আমরা দায়িত্ব মুক্ত হই বটে, তবে ও বেশি দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। হয়তো বাড়ির লোকের সঙ্গে ওর আর দেখাই হবে না। হাইবানেশনে রাখলে সেটা সম্ভব। কারণ ওই সময় ওর রোগ বৃদ্ধি হবে না, একই অবস্থায়। থাকবে। আসলে স্যার হিউম্যান-হাইবার্নেশন হাতে কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। অথচ এমন নতুন এবং বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোনো মানুষকে স্বেচ্ছায় পাওয়া দুষ্কর। কাজেই সুযোগটা

নিতে চাইলেন। রিস্ক নেই। কারণ আশপাশের লোকের কোনো আগ্রহই নেই বৃদ্ধ সম্বন্ধে। ব্যাপারটা শুধু জানব আমরা নিজেরা ক’জন। যদি অঘটন ঘটে, হিম-নিদ্রা চিরনিদ্রা হয় বৃদ্ধের, বলে দিলেই হবে বৃদ্ধ অসুখে মারা গিয়েছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

তারপর কী হল বৃদ্ধের? - প্রশান্ত জানতে চায়।

অমল বলল,ভাগ্যবশত দিন কুড়ি বাদে একজন এসে এখানে বৃদ্ধের খোজ খবর করতে থাকে। ভদ্রলোকের পরিচয়ে জানলাম সে-ই বৃদ্ধের ছোট ভাই। বললেন, যে তার। দাদার মাথার গোলমাল। বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। এমনি আগেও ঘটেছে। তবে ফিরে এসেছেন নিজে নিজেই। কয়েকদিন বাদে, বা কাছাকাছি কোথাও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এতদূরে আসেনি কখনও।

আমরা চেপে গেলাম আসল ব্যাপার। বললাম যে, এখান থেকে তো চলে গিয়েছেন। উনি। ঠিকানা রেখে যান। খোঁজ পেলে চিঠি দিয়ে জানাব।

সেই বৃদ্ধকে হিম-নিদ্রা থেকে জাগানো হল। চার-পাঁচ দিনে তাকে যতটা সম্ভব সুস্থ করে তোলা হল। তারপর চিঠি দেওয়া হল ওঁর ভাইকে।

প্রথম কেস হিসাবে যদিও ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তার রেজাল্ট সম্পর্কে আমরা খুব নিশ্চিত নই।

-কেন?

—কারণ বুদ্ধের হাইবার্নেশন পিরিয়ড ছিল খুব অল্প। এবং হাইবার্নেশনের ফলে বৃদ্ধের দেহ-মনে কোনো ক্ষতি হয়েছিল কিনা তা আমরা ঠিক জানতে পারিনি। বৃদ্ধ মাত্র দু'মাস বাদেই মারা যান। সুতরাং মেশেমশায়ের কেসটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টের দিক থেকে খুবই সিগনিফিক্যান্ট। বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন তো?—চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত। অমল একটু চুপ করে থেকে বলল,- মনে তো হয়। প্রশান্ত লক্ষ করল অমলের মুখে সংশয়ের ছায়া। সে অন্য প্রসঙ্গে গেল, —ডঃ সেনের সঙ্গে তোরা ক'জন কাজ করছিস?

অমল বলল, – তিনজন। অবশ্য এ বাড়ির দারোয়ান ও মালিকে বাদ দিয়ে। রিসার্চের কাজে সাহায্য করি আমি, অজয় আর বরেন। অজয়কে তো দেখলি। ও ডাক্তারি পাশ করেছে। বরেন যন্ত্রপাতির ব্যাপারে এক্সপার্ট। বলতে পারিস, আমিই

ডঃ সেনের প্রধান সহকারী। রিসার্চে খুটিনাটি ও গোপনীয় বিষয় নিয়ে উনি আমার সঙ্গেই কেবল আলোচনা করেন। আরও একজন অবশ্য আসত এখানে। তার আসা আপাতত বন্ধ করা হয়েছে।

কে? –ডঃ সেনের পুরনো কাজের লোক, বংশী। সাধারণত স্যারের সঙ্গেই সে আসত। স্যারের খাওয়া-দাওয়া যত্ন-আত্তির জন্য। তার গতিবিধি ছিল এ বাড়ির সর্বত্র। এমনকী ল্যাবরেটরি বা হাইবার্নেশন চেম্বারেও সে ঢুকে পড়ত। কে আটকাবে ওকে? ডঃ সেনের কথাই মানে না। বরং স্যারকেই ধমকায়।

—তা ওর আসা বন্ধ হল কেন?

বংশী মহা কৌতুহলে মাঝে মাঝে দেখত ঘুম পাড়ানো জীবগুলিকে। বৈজ্ঞানিক কৌশলে ওর বিশ্বাস ছিল না। ভাবত, তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার। যাহোক, সেই বৃদ্ধকে হাইবার্নেট করার পর, বংশী মহা ঝামেলা লাগিয়ে দিল। ওর ধারণা হল স্যার তান্ত্রিক বানে গিয়েছেন। এবং শৰ সাধনা শুরু করেছেন। ফলে স্যারের কাছে কান্নাকাটি, তর্জন-গভনি করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে স্যার বংশীর এখানে আসা বন্ধ করে দিলেন। তবে ভাগ্যি ভালো, বংশী অতি বিশ্বসী লোক। এখানকার রিসার্চের কথা বাইরে বলে না। নইলে মানুষ নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে জানলে, খবরের কাগজে হইচই জুড়ে দিত। আমাদের রিসার্চ হয়তো পণ্ড হত।

—তোদের রিসার্চ খুব গোপনে হচ্ছে, তাই না?

—তা তো বটেই! বিশেষত হিউম্যান-হাইবার্নেশন ব্যাপারটা একদম গোপন রাখা হয়েছে। সাধারণ লোক ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে? রিসার্চ-ওয়ার্কাররা ছাড়া মাত্র দু-একজন বাইরের লোক জানে আমরা কী করছি। যেমন তোর বাবা জানতেন।

—আর কে জানে?

—ঠিক তা জানি না স্যার কাকে কাকে বলেছেন। তবে মিঃ মান্ডি জানেন।

—মান্ডি কে?

—বম্বের এক বিজনেসম্যান। এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা করেন। ইন্ডিয়ার নানা জায়গায় ওঁর অফিস আছে।

—তা মান্ডি জানলেন কীভাবে?

—স্যারের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয় দিল্লিতে। রিসার্চের জন্য জার্মানি থেকে একটা যন্ত্র আনাবার চেষ্টা করছিলেন তখন ডঃ সেন। মান্ডিকে অনুরোধ করেন এটা তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিতে।

অমল বলে চলে :

মান্ডি কৌতুহলী হয়ে জানতে চায় কী বিষয়ে রিসার্চ? স্যার অল্পসল্প আভাস দেন। মান্ডি যন্ত্রটা আনিয়ে দেন খুবই কম খরচে। এরপরেই স্যারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। স্যার মান্ডিকে তাঁর রিসার্চের বিষয়ের অনেক কথা বলেন। এমনকী ভবিষ্যতে তার হিউম্যান হাইবার্নেশন প্রোগ্রামও।

মান্ডি লোকটা খুব দিলখোলা এবং আলাপী। তিনি খুবই আগ্রহ দেখান। এমনকী ডঃ সেনকে আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্যও দিতে চাইলেন। একসময় স্যার রাজি হলেন এই সাহায্য নিতে। আসলে তখন ডঃ সেনের হাত প্রায় শূন্য। তার ওপর গবেষণার এই বিরাট খরচ। স্যার সরকারি সাহায্যের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো হেল্প পাননি। দু-একজন কেষ্ট বিধু সায়ান্টিস্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ডঃ সেন যদি তাদের সঙ্গে নেন, গবেষণার অর্থ তাহলে জোগাড় হতে পারে। অথচ তারা হাইবার্নেশন রিসার্চের কিছু বোঝেন না। অর্থাৎ মতলব, ডঃ সেন সফল হলে তাঁরা ফোকটসে ভাগ বসাবেন। স্যার রাজি হননি। অবশেষে নিজের পয়সায় গবেষণা শুরু করেন।

ডঃ সেনের অনেক টাকা বুঝি? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

—ছিল। এখন আর নেই। বিখ্যাত সার্জেন ছিলেন। এদেশে এবং আমেরিকায় ডাক্তারি করে প্রচুর রোজগার করেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে আমেরিকায় থাকার সময়, হাইবার্নেশন রিসার্চে আকৃষ্ট হয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে দেন। কালিফোর্নিয়ার এক বিখ্যাত ল্যাবরেটরিতে এই নিয়ে রিসার্চ করেন পাঁচ-ছয় বছর। তারপর দেশে আসেন।

আসলে উনি আর খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এক এক সময় হতাশ হয়ে ভাবছিলেন, ফিরে যাবেন আমেরিকায়। মিঃ মান্ডির প্রস্তাবে তাই খুব খুশি হলেন। লুফে নিলেন অফার। মান্ডির কলকাতা অফিসের ম্যানেজার মিঃ

গুজরালকে জানালেই আমাদের দরকার মতো নগদ টাকা বা কোনো জিনিস পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বছরখানেক কয়েক লক্ষ টাকার হেল্প পাওয়া গিয়েছে মান্ডির থেকে। অবশ্য মান্ডি স্বয়ং এই ল্যাবরেটরিতে এসেছেন মাত্র একবার। সময় পান না। তবে চিঠিতে গবেষণার বিষয়ে স্যারের কাছে খোজ খবর নেন।

ডঃ সেনকে সাহায্য করায় মান্ডির স্বার্থ? কোনো শর্ত দিয়েছেন নাকি?—প্রশান্ত প্রশ্ন করল।

-না। শর্ত কিছু দেননি। বলেছেন স্যারকে, আপনি এই গবেষণায় সফল হলে আমায় একট কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তাই আমার মস্ত পুরস্কার। তাতেই আমি ফেমাস হয়ে যাব। আসলে বুঝলি ব্ল্যাক মানি। ব্যবসাদার তো ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার মতলব। কীভাবে লুকনো টাকা খরচ করবে ভেবে পায় না। এইভাবে কাজে লাগিয়ে যদি নাম হয়ে যায়। তা যাকগে, সদ্গতি হচ্ছে ওর টাকার।

মান্ডি। বোম্বাই। প্রশান্তের স্মৃতিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল নামটা। কোথায় যেন এর কথা শুনেছে? অমলের শেষ কথায় তার মনে পড়ে যায়। সে বলে ওঠে, -এর পুরো নামটা কী জানিস? ফুলচাঁদ মান্ডি কি?

হ্যা হ্যা ঠিক বলেছিস। জানাল অমল।

প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে,-এর কথা আমি শুনেছি আগে। আমার এক সম্পর্কে কাকা বম্বেতে থাকেন, তার কাছে। ঠিকই বলেছিস, এই মান্ডির প্রচুর ব্ল্যাক মানি। কাকা বলছিলেন যে, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট নয়। আসলে মান্ডি স্মাগলিং-এর ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা বাইরের লোক দেখানো ব্যাপার। পুলিশ কয়েকবার রেইড করেছে ওর বাড়ি। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। ফুলচাঁদ মান্ডি নাকি অতি গোল লোক।

শুনে অমল গুম মেরে গেল।

প্রশান্ত বলল,-এ টাইপের লোকের নানা ধান্দা। টাকা যে দিচ্ছে হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নেয় নাকি?

-কই না তো!

অমল মনে মনে ভাবে, কে জানে, হয়তো সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সাহায্য করে নাম কিনতে চায়। পরে সেই সুনাম ভাঙিয়ে ফায়দা লুটবে। তবু সতর্ক থাকা উচিত। ডঃ সেনকে মান্ডি সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখা ভালো।

দিন পনেরো কেটেছে। অবিনাশবাবুর হিম-নিদ্রা ভেঙেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রশান্ত বাবার হার্ট-অপারেশনের ব্যবস্থা করছে।

প্রশান্ত একদিন বলল অমলকে, জানিস বাবাকে বললাম তোমায় ফের ঘুম পাড়িয়ে রাখি, যদ্দিন না অপারেশন হয়। কোনো রিস্ক থাকে না। তা বাবা স্রেফ উড়িয়ে দিলেন আমার কথা। বললেন যে, বহু বছর দিব্যি ভোগ করেছি জীবনটা। এখন যদি টপ করে অক্কা পাই আপশোস নেই। তুই কাছে থাকলেই হল। আর আমি ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করব না। তবে হ্যা, ফের যদি তুই বাইরে যাস অনেক দিনের জন্যে তখন না হয় ঘুম দেওয়ার কথা ভাবা। যাবে। কী যে করি ? দেখি যত তাড়াতাড়ি অপারেশনটা করানো যায়।

প্রশান্ত সময় পেলেই যেত ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে। গল্প গুজব করত অমলের সঙ্গে। সন্ধেবেলা অমলের ডিউটি থাকলে প্রশান্ত কোনো কোনো দিন তার কাজের শেষে অমলের কাছে গিয়ে পরে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরত। অমলদের গবেষণা নিয়ে প্রশান্তর খুবই কৌতুহল। তবে এ বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করত না। মলয় যতটুকু নিজে থেকে বলত তাই শুনত।

ডঃ সেনের সঙ্গেও প্রশান্তর আলাপ হল। আলাপ সামান্য আগেও ছিল, এবার হল। ঘনিষ্ঠতা।-ডঃ সেনের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছোটখাটো সতেজ চেহারা। গৌর বর্ণ। ধারালো মুখ। পুরু চশমার আড়ালে উজ্জ্বল চোখ। মানুষটি খেয়ালি। কখনও বেশ গল্প। করেন। কখনও গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক, চুপচাপ। প্রশান্ত শুনেছে, ডঃ সেনের স্ত্রী মারা। গিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, থাকে কানপুরে।

এক সন্ধ্যায়। ল্যাবরেটরির ড্রইংরুমে বসে ডঃ সেন ও প্রশান্ত। কফি পান হচ্ছে। অমলের ডিউটি শেষ হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। ডঃ সেন বেশ খোশমেজাজে আছেন। এটা সেটা গল্প হচ্ছে। সুযোগ বুঝে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, এই হিউম্যানহাইবার্নেশনের ভবিষ্যত কী? মানে আমাদের কি কাজে লাগবে? কিছুটা অবশ্য বুঝেছি। যেমন, এই সময় দেহের ক্ষয়ক্ষতি হয় খুব কম। তাই এই

অবস্থায় রেখে দিলে পরে সুযোগ। মতো চিকিৎসা করানো যেতে পারে। যেমন বাবার কেস।

ডঃ সেন বললেন, —সে একটা দিক। এছাড়াও ঢের ঢের উপকারে লাগবে, আর্টিফিসিয়াল হাইবানেশন যদি সফল হয়। এমন দিন আসবে, যখন যে কোনো প্রাণীকে বছরের পর বছর কৃত্রিম উপায়ে হিম-নিদ্রায় রেখে দেওয়া যাবে। মনে কর মানুষকে দীর্ঘদিন হাইবানেট করা সম্ভব হল। আজ মানুষের যেসব অসুখের চিকিৎসা জানি না। হয়তো, কয়েক বছর বাদে তাদের অনেকগুলিরই চিকিৎসা আবিষ্কার হবে। তখন ওই সব রোগে আক্রান্ত মানুষকে হাইবানেশন ভাঙিয়ে, তাদের নতুন চিকিৎসায় বাঁচানো যাবে।

একটু চুপ করে থেকে ডঃ সেন আবার বললেন, - আরও দিক আছে। হাইবানেশন প্রাণীর জীবনকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন ধর ছোট বাদুড় এবং ছুঁচোর উদাহরণ। দু'জনের ওজন প্রায় একই। কিন্তু বাদুড়ের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের পরিমাণ অনেক কম। কারণ তারা রাতে এবং মাঝে মাঝে দিনের পর দিন হিম-নিদ্রায় কাটায়। ফলে যেখানে দুচো বাঁচে বড়জোর বছর দেড়েক, ওই আকারের বাদুড় বাঁচে প্রায় কুড়ি বছর। হাইনেশনে থাকার সময় প্রাণীর বয়স বাড়ে না, জরা আসে না।

এখন মানুষ মহাকাশ অভিযানের তোড়জোড় করছে। মহাকাশযানে যদি চারজন মানুষ। যায়, তাদের সবাইয়ের একসঙ্গে জেগে থাকার প্রয়োজন নেই। দু'জন জেগে থেকে মহাকাশযান চালনা করুক। বাকি দু'জন থাকুক হিম-নিদ্রায়। এইভাবে পালা করে চলুক তাদের বিশ্রাম ও জাগরণ। এতে মহাকাশযাত্রীদের জন্য ঢের কম অক্সিজেন ও খাবার নিলে চলবে। মহাকাশ যাত্রার একঘেয়েমিও কম ভোগ করতে হবে। আবার হয়তো তোমার কোনো কাজ নেই কয়েক মাস। শুধু খেয়ে শুয়ে সময় কাটানো। হিম-নিদ্রায় কাটাও। দরকার মতো জাগো। তোমার শরীর ও মনের বিশ্রাম হবে। ভবিষ্যতে কোনো দেশ হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তাদের হাইবার্নেশনে রেখে দেবে। সৈন্যদের খাওয়ার খরচ বাঁচবে, তারা তাজাও থাকবে। দরকার মতো তাদের জাগিয়ে তুলে যুদ্ধে পাঠানো হবে। পরমাণু যুদ্ধের সময় যারা হাইবানেশনে থাকবে তাদের শরীরে মারাত্মক বিকিরণের প্রভাব পড়বে অনেক কম।

ঘরের সিলিংয়ে চোখ রেখে আনমনা ভাবে নিজের মনে বললেন ডঃ সেন,-হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। স্তন্যপায়ী জীব এবং মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে হাইবার্নেট করার

সব রহস্য আর কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে যাবে। তবে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আরও সুদুরে। তারা এখন চিন্তাভাবনা করছেন সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন আবিষ্কার নিয়ে।

সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন কী? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

ডঃ সেন জবাব দিলেন, বাংলায় বলা উচিত রুদ্ধ বা স্থগিত জীবন। হাইবার্নেশনের উন্নততর ধাপ। এই প্রক্রিয়ায় জীবের শরীরের মেটাবলিক-অ্যাকটিভিটি অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকবে। শরীরে তখন কোনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটবে না। অথচ প্রাণ টিকে থাকবে। এইভাবে প্রাণীকে যত বছর খুশি রাখা যাবে। আবার তাকে জাগিয়ে স্বাভাবিক করে তোলা যাবে। এই অবস্থায় আনতে হলে, দেহের উত্তাপ সব নিম্ন তাপমাত্রায় অর্থাৎ এবসলিউট-জিরো টেম্পারেচার বা-২৭৩ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি নামিয়ে এনে, দেহকোষগুলির তরল উপাদানকে বরফের মতো জমিয়ে ফেলা হবে। আবার প্রয়োজন মতো দেহকে স্বাভাবিক করে তোলা চলবে। অবশ্য এর সঙ্গে থাকবে বহু রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অতি দুরূহ সব ব্যাপার। যা এখনও প্রায় জল্পনা-কল্পনার স্তরে।

এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনায় সচকিত প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, -সাসপেন্সেল, অ্যানিমেশনে মানুষের কী কী সুবিধে হবে স্যার?

প্রচুর প্রচুর।—ডঃ সেন উত্তেজিত: ভবিষ্যতে হয়তো মহাকাশ যাত্রা হবে বহু দূর দর গ্রহে। শত শত বছরের যাত্রা। দশ বিশ বছরের জন্য হাইবানেশন প্রক্রিয়া চলতে পারে, কিন্তু শত সহস্র বছরের অভিযানে মহাকাশচারীদের সাপেন্ডেড-অ্যানিমেশনে রাখা ছাড়া উপায় নেই। স্পেসশিপ-এর সুপার-কম্পিউটার দেখাশোনা করবে রুদ্ধ-প্রাণ যাত্রীদের। এবং দরকার মতো তাদের জাগিয়ে তুলবে। এই ব্যবস্থা ছাড়া বহু দূর গ্রহে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। নইলে মানুষের পরমায়ুই তো শেষ হয়ে যাবে যাত্রা পথে। এ ছাড়াও পরমাণ যুদ্ধের রক্ষাকবচ হিসাবে বা ভবিষ্যৎ কালে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সুযোগ নিতে সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন, হাইবানেশন থেকেও মানুষের ঢের বেশি উপকারে আসবে।

আমতা আমতা করে প্রশান্ত বলে, – আচ্ছা স্যার, রামায়ণে পড়েছি কুম্ভকর্ণ নাকি বছরে ছয় মাস জেগে থাকত, আর ছয় মাস ঘুমিয়ে কাটাত। সেটা কি হিউম্যান হাইবানেশন কে?

ডঃ সেন হেসে বললেন, হতে পারে, হতে পারে। ব্যাপারটা সত্যি হলে বলতে হয় সে যুগে বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছিল।

উৎসাহ পেয়ে প্রশান্ত বলল, "রামের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কুম্ভকর্ণকে হঠাৎ জাগিয়ে তুলে, তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে পাঠানো হয়। হয়তো সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় পায়নি। তাই হয়তো ভালো মতো যুদ্ধ করতে পারেনি। ফলে বেচারা মারা পড়ে। নইলে সে তো অপরাজেয় ছিল। হতে পারে। ইউ মে বি রাইটডঃ সেনের মুখে কৌতুক মেশানো হাসি।

স্যার, আপনার হিউম্যান-হাইবার্নেশন রিসার্চ তো প্রায় সাসেসফুল। উজ্জ্বল মুখে বলল প্রশান্ত। উঁহু। - হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লেন ডঃ সেন: আমার কাজ এখনো ঢের বাকি। -কেন? বাবাকে তো ঠিক মতোই...

—হু, অবিনাশবাবুর কেস থেকেই বুঝেছি। প্রোগ্রাম ছিল প্রতি দু-সপ্তাহ অন্তর ওঁর। বডি-টেম্পারেচার কয়েক ঘণ্টার জন্য নর্মালে নিয়ে আসা হবে। তখন একবার চেক-আপ হবে এবং ওঁর দেহকোষে ইতিমধ্যে যে সামান্য এনার্জি ক্ষয় হয়েছে তা পূরণ করা হবে। কিন্তু তৃতীয় বার এমনি করার পর দেখা গেল যে, হাইবার্নেশন পিরিয়ডে ওঁর শরীরে ক্ষয় বেড়েছে। দেহের তাপ আর প্রথমবারের মতো নামানো যাচ্ছে না। হার্টবিটও বাড়ছে। ফলে ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা আরও তাড়াতাড়ি করতে হল। এইভাবে ওঁকে পাঁচ-ছয় মাসের বেশি রাখা সম্ভব হত না।

প্রশান্ত বুঝল, এই জন্যেই সেদিন অমল বলেছিল যে, সে আগে আগে ফেরায় বাবার মঙ্গলই হয়েছে।

ডঃ সেন ক্ষুব্ধ স্বরে বলতে থাকেন, এখনও অনেক রহস্যই অজানা। স্বাভাবিকতা যে সব স্তন্যপায়ী জীবরা হাইবানেট করে, তাদের দেহে এই সময় কী কী পরিবর্তন ঘটে।

কী কী হরমোন ও এঞ্জাইম তৈরি হয়? কী ভাবে হয় তাদের দেহে ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা? আরও কত খুঁটিনাটি তথ্য।

তবে হয়ে যাবে। সবই আবিষ্কার হবে ক্রমে ক্রমে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে এই রিসার্চে আধুনিক উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরি আর যন্ত্রপাতি দরকার। বড় খরচ। কতকাল এ খরচ টানতে পারব জানি না। মিঃ মান্ডির থেকেই বা আর কত নেব?

তাছাড়া মান্ডি সম্বন্ধে অমলের কাছে যা শুনলাম।—ডঃ সেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশান্তর দিকে তাকালেন। বোঝা গেল মান্ডির পরিচয় তার কানে পৌছেছে। ডঃ সেন বিড়বিড় করেন,—ভয় হয়। ওর মতলব কী, ঠিক বুঝছি না।

সাত

সকাল সাতটা নাগাদ অমল এসে হাজির হল প্রশান্তর কাছে। প্রশান্ত অবাক। কী ব্যাপার এখন! কলেজ নেই? —না, আজ অফ-ডে। একটা ইন্টারেস্টিং খবর দিতে এলুম।

—মিঃ মান্ডি একটা অনুরোধ জানিয়েছেন স্যারকে। অদ্ভুত রিকোয়েস্ট।

—কী রকম?

—মিঃ মান্ডি তার নিজস্ব একটা হাইবার্নেশন-চেম্বার করতে চান বম্বেতে। সেখানে শুধু তাঁর ফ্যামিলি-মেম্বারদের দরকার মতো হাইবার্নেট করে রাখা হবে। ওঁর মায়ের নাকি বয়স হয়েছে আশির ওপর। শরীর খুব খারাপ। এদিকে বৃদ্ধার ভারি শখ নাতি নাতনি সবার বিয়ে-শাদি দেখে যাবেন। মান্ডির ইচ্ছে মাকে হাইবার্নেশনে রাখা হোক। নাতি নাতনিদের বিয়ের সময় একবার করে তাকে ঘুম থেকে জাগানো হবে। ফের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে। তাছাড়া মাণ্ডির পরিবারে কারও ক্যানসার বা ওই জাতীয় রোগ হলে, যার চিকিৎসা এখনও অজানা, তাদেরকে হাইবার্নেশনে রাখতে চান মান্ডি! কারণ ভবিষ্যতে ওই সব রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার হলে তাদের প্রাণরক্ষা হতে পারে!

মান্ডি কি চিঠি লিখেছেন? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত : ডঃ সেনের রিসার্চ কদূর এগিয়েছে মান্ডি জানেন দেখছি!

হু, স্যারকে উনি এই বিষয়ে চিঠিপত্র লেখেন জানি। তবে তিন দিন আগে উনি হঠাৎ কলকাতায় এসেছিলেন। তখন স্যারের সঙ্গে দেখাও হয়েছে। আমাদের রিসার্চের প্রোগ্রেস সম্পর্কে কথাও হয়েছে কিছু। এত টাকা দিচ্ছে, এ খবরটুকু জানার অধিকার আছে বইকি মান্ডির। তবে সায়ান্টিফিক ডিটেলস নিয়ে উনি কিছু প্রশ্ন টশ্ন করেননি। বোঝেও না কিছু। তোর বাবার কেসটা শুনে স্যারকে নাকি খুব কনগ্রাচুলেশনস জানিয়েছেন। তারপরই নিজেদের জন্য বম্বেতে হাইবানেশনের ব্যবস্থা করার প্ল্যান দেন।

স্যার অবশ্য বলেছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। রিসার্চের খুঁতগুলো আগে ঠিক হোক। তাছাড়া আগে কোনো ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে ছাপা হোক ওঁর রিসার্চের ফলাফল।

মান্ডি তবু ছাড়েনি। বলেছেন যে মেসোমশায়ের মতো তিন-চার মাস ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা হলেও আপাতত চলবে। মা অন্তত মেজ নাতির বিয়েটা দেখে যাক। মানে মান্ডির মেজ ছেলে এখন কলেজ পড়ছে। মাস ছয়েক বাদে ফাইনাল পরীক্ষা। তারপর বিয়ে দেবে। অথচ ওঁর মায়ের শরীরের যা হল, যে কোনো দিন গত হতে ব্যাপারটা একদম গোপন রাখা হবে। এবং হাইবানেশনের ব্যাপারে কোনো অঘটন ঘটি সে দায়িত্ব কখনওই ডঃ সেনের ঘাড়ে চাপবে না। সম্পূর্ণ রিস্ক মান্ডির। এক্কেবারে আধুনিক ও উন্নত ল্যাবরেটরি ও হাইবার্নেশন চেম্বার বানাবার খরচ দেবেন মান্ডি। স্যার বলেছেন, যে, চেষ্টা করবেন মান্ডির অনুরোধ রাখতে। মুশকিল! গাদা গাদা টাকা দিচ্ছে। এখন এই আবদার এড়ানো দায়।

পরের দিন সন্ধ্যায় অমল ফের প্রশান্তর বাড়িতে হাজির। বলল,—জানিস মিঃ মান্ডি একটা অফার পাঠিয়েছেন আমাকে, ওঁর ম্যানেজার গুজরাল মারফত।

কী অফার ?—প্রশান্ত জানতে চায়।

—মিঃ মান্ডির প্রাইভেট-হাইবার্নেশন চেম্বার তৈরি হলে আমি তার চার্জ নিতে রাজি আছি কিনা? মাইনে এখন যা রোজগার করছি তার দু’গুণ দেবে।

—হঠাৎ তোকে কেন?

—কারণ আমি কাজটা জানি। মান্ডি চান ডঃ সেনের অ্যাসিস্টেন্টদের থেকে কেউ আপাতত তার প্রাইভেট চেম্বারের ভার নিক। তাহলে রিসার্চের তথ্য গোপন থাকবে। বাইরের লোককে ট্রেনিং দিলে আমাদের রিসার্চ সিক্রেট ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মান্ডি তা চান না। ডঃ সেনও রাজি নন, বাইরের কাউকে এ বিষয়ে কিছু জানাতে।

—মান্ডি তাহলে প্রাইভেট হাইবার্নেশন-চেম্বার করছেনই।

—হু। একদম উঠে পড়ে লেগেছেন। ওঁর মাকে মেজ নাতির বিয়েটা দেখাবেনই। নাছোড়বান্দা লোক বটে!

তুই কী ভাবছিস?—জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

আমি যাব না। বলল অমল : আমি স্যারের সঙ্গে রিসার্চ চালিয়ে যেতে চাই। বম্বে গেলে তা বন্ধ হয়ে যাবে।

-তাহলে?

—আমায় না পেলে গুজরাল নিশ্চয় অজয় বা বরেনকে অ্যাপ্রোচ করবে। ওদের কেউ হয়তো রাজিও হয়ে যাবে। ওরা মান্ডির আসল পরিচয় জানে না। তাছাড়া প্রচুর মাইনের টোপ।

—স্যার জানেন, তোদেরকে চাকরির অফার দিচ্ছে? —এখনও জানেন না। তবে শুনবেন ঠিকই। কী করবেন! নিরুপায়। মান্ডির অনুরোধ রাখলে হয়তো তার সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটুকু দাবি মেটালে স্যারের রিসার্চের বিশেষ ক্ষতি হবে না। রিসার্চের গোপন তথ্য ফাস না হলেই হল।

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বলল, আর একবার ভেবে দেখ অফারটা। কোনো খাটুনি নেই। শুধু মান্ডির ঘুমন্ত নানির তদারকি। স্রেফ বসে বসে অতগুলো টাকা পকেটে পুরবি।

ভাগ! প্রশান্তর রসিকতায় চটে গিয়ে উঠে পড়ল অমল।

সাতদিন বাদে সন্ধ্যায়। প্রশান্ত ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে গেল অমলের খোঁজে। ইতিমধ্যে দু'জনে আর দেখা হয়নি।

অমল ল্যাবরেটরিতে ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, আমার আজ ফিরতে রাত হবে। তুই অপেক্ষা করিসনে। বোস, এক কাপ কফি খাই। তারপর যাবি। খুব ব্যস্ত বুঝি!জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

—হ্যা। আর একটা হিউম্যান-হাইবার্নেশন কেস জুটেছে। গতকাল তাকে ঘুম পাড়ানো হল।

—। কে আবার রাজি হল?

—একজন মাঝবয়সি পুরুষ। আমরা চিনি না। মিঃ মান্ডি পাঠিয়েছেন। নাগপুরে থাকেন। ভদ্রলোককে মিঃ গুজরাল নিয়ে এসেছিলেন ডঃ সেনের কাছে। মান্ডির চিঠি এনেছিল গুজরাল।

-কী ব্যাপার?

—মান্ডি লিখেছেন, এই ভদ্রলোকের নাম দশরথ। মান্ডির নিকট আত্মীয়। দশরথবাবুর ক্যানসার হয়েছে কিডনিতে। আর্লি স্টেজ। মান্ডির ইচ্ছে দশরথবাবুকে নিয়ে বিদেশে যাবেন চিকিৎসা করাতে। কিন্তু এখন ব্যবসার কাজে মান্ডি ভীষণ ব্যস্ত। তাছাড়া জোগাড়যন্ত্র করতেও কম করে মাস দুই লাগবে। এই সময়টা যদি 'দশরথবাবুকে হিম-নিদ্রায় রাখা যায় তাহলে রোগ আর বাড়বে না। বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন মিঃ মান্ডি। ডঃ সেনও এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ ছাড়েননি।

—কী ভাবে রাখা হয়েছে ওকে? বাবার মতো? —হ্যা। —একবার দেখাবি? বাবাকে সেদিন ভালো করে লক্ষ করিনি। কষ্ট হচ্ছিল দেখতে।

বেশ চল। দু’জনে হাইবার্নেশন চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

সেই কফিনের মতো বাতটির পাশে দাঁড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন মানুষটিকে দেখল প্রশান্ত। খুটিয়ে লক্ষ করল বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক কারিগরি, প্রায় আধঘণ্টা ধরে। অনেক প্রশ্নও করল অমলকে।

বিদায় নেওয়ার সময় প্রশান্ত মিচকে হেসে বলল, “মাভি এবার তার মাকেও এখানে পাঠাবে। কাল আমি বম্বে যাচ্ছি দু-তিন দিনের জন্যে। ভেবেছিলাম ঠিকানাটা নিয়ে মান্ডির সঙ্গে দেখা করব। তোর বদলে আমিই না হয় মান্ডির প্রাইভেট হাইবার্নেশন চেম্বারের চাকরিটা চাইব। ডঃ সেনকে বলে একটা ট্রেনিং নিয়ে নিলেই হবে। তা বাবা দরকার নেই। হয়তো ছেলের নানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে এখানে পৌছে দিতে।

বম্বে থেকে ফিরেই দুপুর তিনটে নাগাদ প্রশান্ত সোজা হাজির হল ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে। অমল ছিল সেখানে। জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরলি?

আজ।—উত্তর দিল প্রশান্ত : শোন, দশরথবাবু কি এখনও ঘুমিয়ে আছেন?

-হ্যা আছে বইকি। -আমি একবার তাকে দেখতে চাই। -কেন?

হিম-নিদ্রায় আচ্ছন্ন দশরথবাবুকে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে প্রশান্ত পকেট থেকে একটা পত্রিকা বের করল। ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা। সেই পত্রিকার পাতা উল্টে একটা ছবি বেশ করে খোলা পাতাটা টেবিলের ওপর রেখে প্রশান্ত বলল,—অমল দেখ, এর সঙ্গে দশরথবাবুর মিল পাচ্ছিস?

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িসহ, শার্ট গায়ে এক ব্যক্তির আবক্ষ ফোটোগ্রাফ থেকে ছাপা ছবি। প্রশান্ত আঙুল চাপ দিয়ে ছবির লোকটির দাড়িটুকু ঢেকে দিয়ে বলল, এবার লক্ষ কর।

—হু, মিলটা স্পষ্ট। যদিও চুলের কায়দা একটু অন্যধরনের। ছবি লোকের টেরি হালফ্যাশনের। দশরথবাবুর চুল সাদা মাটা পাট করে আঁচড়ান। সিথিও অন্য ধারে। তবু নাক চোখ চিবুকের গড়নে এবং গালে একটা কাটা দাগের মিল দেখে মনে হয় দু'জনে একই লোক।

এ ছবি কার?—প্রশ্ন করল অমল।

—একজন ক্রিমিনালের। স্মাগলার। বম্বে পুলিশ ওকে খুঁজছে একটা খুনের কেসে। ওর চালু নাম জনি। এটা বম্বের পত্রিকা। ছবিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ দশরথবাবুর সঙ্গে যেন। মিল খুঁজে পেলাম।

হু ঠিক এক লোকই বটে। খাসা লুকোবার ব্যবস্থা হয়েছে ওর। যাক, কী। করবি এখন?

স্যারকে বলি আগে! —অমল রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে।

ডঃ সেনের বাড়ি। ডঃ সেন, অমল, প্রশান্ত চিন্তিত মুখে বসে আছে। সব শুনে শুম্ মেরে গিয়েছে ডঃ সেন। নিজে গিয়ে ঘুমন্ত দশরথ এবং জনির ছবি মিলিয়ে দেখে এসেছেন।

অমল বলল, -বোঝা যাচ্ছে এই জন্যেই প্রাইভেট হাইবার্নেশন চেম্বার বানাতে চাইছে মান্ডি। দলের লোককে প্রোটেকশন দিতে। প্রয়োজনে লুকিয়ে রাখতে। ফ্যামিলির ব্যাপারটা ভাওতা।

দশরথ, ওরফে জনির ক্যানসারের প্রমাণ, মানে এক্স রে প্লেট, ডাক্তারের রিপোট ইত্যাদি দেখায়নি?—জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

দেখিয়েছিল। উত্তর দিল অমল : নিশ্চয় সব ফলস। মিথ্যে। দশরথ নামে অন্য কারও রিপোর্ট ম্যানেজ করে এনেছিল। টাকার জোরে কিনা হয়?

ডঃ সেন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন অমলের কথায়। এখন কী করবেন স্যার?—জানতে চাইল অমল।

ভাবছি পুলিশে খবর দিই। – বললেন ডঃ সেন।

না স্যার, সেটা ঠিক হবে না। আপত্তি জানাল প্রশান্ত : মান্ডি ডেনজারাস লোক। আপনারা ভীষণ বিপদে পড়বেন।

অমল বলল, —তাছাড়া প্রমাণ? মান্ডি যে ওকে পাঠিয়েছে, সেই যে মান্ডির লেখা চিঠি। গুজরাল চলে যাওয়ার পর আর সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেবিলের ওপর ছিল চিঠিটা।

প্রশান্ত বলল,—অর্থাৎ গুজরালই ওটা সরিয়েছে। আটঘাট বেঁধেই প্ল্যান করেছে। সুতরাং মান্ডির কিসসু হবে না। উপরন্তু আপনারাই ঝামেলায় পড়বেন জনিকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে।

তাহলে কী করব? —ডঃ সেন উদ্ভ্রান্ত : সব জেনেশুনে একজন ক্রিমিনালকে রাখা? নাঃ, অসম্ভব।

প্রশান্ত বলল,আমি বলি স্যার, জনিকে আগে কৌশলে সরান এখান থেকে, তারপর আমি ওর ব্যবস্থা করব। হুম। ভাবতে থাকেন ডঃ সেন।

অমল বলল, স্যার যদি গুজরালকে ফোন করে বলি, জনি মানে দশরথবাবুর হাইবার্নেশন প্রসেসে গন্ডগোল হয়েছে। একটা মেশিন ঠিকমতো কাজ করছে না। ওকে আজই জাগানো দরকার। নইলে মৃত্যু ঘটতে পারে। মেশিন সারানো হলে ফের ওকে ঘুম পাড়ানো হবে। বড় জোর দিন সাতেক লাগবে। গুজরাল তো সত্যি মিথ্যে ধরতে পারবে না। বলব, আপাতত দশরথবাবুকে নিয়ে যান। মেশিন ঠিক হলেই খবর দেব।

হুঁ, আমিও এই ধরনের ভাবছিলাম। বললেন ডঃ সেন।

ফার্স্ট ক্লাস প্ল্যান। -বলল প্রশান্ত : এমন ব্যবহার করবেন যাতে গুজরাল ঘুণাক্ষরেও টের পায়, আপনারা আসল ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। ওকে নিয়ে গেলেই, অমল আমায় একটা খবর দিস।

পরের দিন রাত এগারোটা নাগাদ অমলের ফোন এল, প্রশান্ত, জনিকে নিয়ে গেছে গুজরাল।

-কখন?

—আধঘণ্টা আগে। —অর্থাৎ অন্ধকারে লুকিয়ে পাচার। যাক আপদ গিয়েছে। তিনদিন বাদে ভোরে খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠল অমল। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে সংবাদ—কুখ্যাত অপরাধী গ্রেফতার। জনি নামে এক চোরাচালানকারীকে একটি খুনের মামলায় বম্বে পুলিশ খোঁজ করছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশ বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী ফুলাদ মান্ডির কলকাতা অফিসের ম্যানেজার বিনোদ গুজরালের বাড়িতে লুকানো চোরাই মালের সন্ধানে আচমকা হানা দিয়ে জনির সাক্ষাৎ পায়। নেভিল পিন্টো। ওরফে রুস্তম ওরফে জনি নামক এই দুর্ধর্ষ অপরাধীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। জনি গুলি ছুড়ে পালাতে চেষ্টা করে। অবশেষে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ধরা পড়ে। এই সূত্র ধরে মিঃ গুজরাল এবং বম্বেতে মিঃ মান্ডিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অমল তৎক্ষণাৎ প্রশান্তকে ফোনে জানাল,—আজকে কাগজটা দেখেছিস? জনির খবর?

প্রশান্তর উত্তর এল,—হ্যা দেখেছি বইকি। আমার এক পুলিশ মামার কীর্তিকা পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার। তাকে জনির ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম রে নেই, মাভি তোদের সন্দেহ করবে না।

উঃ সেনের বৈঠকখানা। দু'টি মানুষ মুখোমুখি বসে। বিষণ্ণভাবে ডঃ সেন বললেন, —অমল, আমার এখানে রিসার্চের পাট চুল। মান্ডির থেকে আর সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। এবং তা নেওয়া উচিতও হবে না। তাই ঠিক করেছি, ফের আমেরিকায় চলে যাব। আমার পুরনো রিসার্চ-সেন্টারে গবেষণা করতে। ওখান

থেকে বার বার আমায় ডাকছে। বিদেশে আমি বাস করতে চাই না। কিন্তু কী করব? আমি নিরুপায়। ইন্ডিয়ায় আমার গবেষণার সুযোগ কই?

একটু থেমে বললেন, যদি কখনও আবার সুযোগ মেলে নিজের দেশে থেকে এই বিষয়ে কাজ করতে, অবশ্যই ফিরে আসব। এবং তখন তোমাকে ফের চাই। মনে রেখো কিন্তু।

বেদনাময় কণ্ঠে অমল বলল, স্যার আমি সেই অপেক্ষায় থাকব। প্রার্থনা করি আপনার সাধনা সফল হোক।